মন ও মনন

-- বিপুল সাহা

। ১ ।

মানুষের মন এক বিচিত্র রহস্য। আমার মন আমার সবচেয়ে কাছের, সব থেকে আপন। আবার সব থেকে দূরের, সবথেকে বেশী অজানা। তাকে যেন ধরেও ধরা যায় না, জেনেও জানা হয় না। রক্ত(মাংসের এই দেহ হল জৈববস্তু - জড়বস্তু দ্বারা নির্মিত। দেহস্থ হৃদয়-পাকস্থলী-চ(ু-মগজ এ সবই বস্তু। মন দেহে অবস্থান করছে বটে কিন্তু তার কোন দেহ নেই। মন নামে দেহে কোন যন্ত্র নেই, কোন দেহাঙ্গ নেই। অথচ বেশ বুঝতে পারি নিজের মন বলে একটা জিনিষ আছে। তার ভালোলাগা মন্দ লাগা আছে। মন খারাপ করা আছে, মন উদাস হওয়া আছে।

মন তাহলে কী? সে যদি বস্তু না হয় তবে তো অবস্তু। অবস্তু বলে কোন জিনিষ হয় নাকি! এমনিতে হয় না। তবে যদি মনকে বলা হয় একটি ভাব তাহলে একটা কিছু হয়। ভাব (আইডিয়া) হল অবস্তু।

মন মানে সচেতন মানসিক ত্রি(য়া। অচেতন মানসিক ত্রি(য়াও আছে — তাকে মন বলতে চায় না অনেকে। আসলে তারা চেতনা এবং মনের মধ্যে তফাৎ করেন। আমরা এখানে সং(প্ত পরিসরে অতটা সূক্ষ্ম পার্থক্যের মধ্যে যাচ্ছি না। মন ও চেতনা অভিন্ন ধরে নিচ্ছি।

ভাবুকেরা মন নিয়ে ভাবনায় দুই দলে বিভক্ত(। একদল দ্বৈতবাদী যেমন পে-টো থেকে দেকার্তে-লিবনিজ, এমন কি বর্তমানের জন একেল্স্। এঁরা বলেন — বি(্বজগত দুটো সত্তা দ্বারা নির্মিত। একটি বস্তু অন্যটি ভাব। বস্তুর আকার-আয়তন-ওজন আছে। তার অস্তিত্বের প্রমাণ-অপ্রমাণ হয়। ভাব অনুভবের। তাকে ভাবনা দ্বারা জানা যায়। কেবল অনুভবে ভাবনায় তার অস্তিত্ব যার প্রমাণ ব্যক্তি(র নিজের অনুভবেই উজ্জ্বল।

ভাববাদীরা বলেন — সৃষ্টির প্রথম কথাই হল ভাব। ভাবের মধ্যে সম্পৃক্ত(থাকে চেতনা। জগতস্রষ্টা হলেন প্রথম ভাব — সমস্ত চেতনার উৎস। তিনি বস্তু নন। সেই অনাদি অনন্ত ভাবময় সচেতন ঈ(র থেকে অচেতন ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হয়েছে। মানুষ অচেতন বস্তু এবং সচেতন ভাবের সমষ্টি।

বিপরীতে রয়েছে একত্ববাদীরা। তারা খানিকটা বস্তুবাদী। তাদের কথা — এই জগত বস্তুময় এবং অচেতন বস্তুই প্রধান। ভাব বা চেতনা বলে যা মনে হচ্ছে তা বস্তুর গুণ মাত্র। বস্তুজগতের কোন নির্মাতা আছে কিনা জানা নেই কেননা আমরা কোন নির্মাতার প্রত্য(প্রমাণ পাইনি। সম্ভবতঃ বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে আপনা আপনি।

একত্ববাদীদের একটি দল হল আচরণবাদীরা (ওয়াটসন-স্কিনার)। তাদের মতে - মন বলে কিছু নেই(আচার আচরণই মূল কথা। এ ভাবনা এখন অনেকটাই পরিত্যক্ত(। জ্ঞানবাদী এবং স্নায়বিক মনোবিদ্যার বিকাশে মন নিয়ে ভাবনা অনেক বদলে গিয়েছে। একদল (পে-স, আর্মস্ট্রং, চার্চল্যান্ড, সিয়ার্ল) বলেন — মন আসলে মগজের এক অবস্থা। ডেনেটরা বলেন ফাংশনালিজমের কথা। মন অন্তস্থঃ কার্যকারণ সম্পর্ক বা মগজত্রি(য়া। কেউ ভাবছেন - মন তথ্য প্রত্রি(য়াকরণ (ইনফর্মেশন প্রসেসিং) মাত্র।

। ২ ।

দেহ-মন নিয়ে মানুষ। দেহের অস্তিত্ব আছে। মন ভাব হলেও তার অস্তিত্ব আছে, বাস্তবতা আছে। অবশ্য তার অস্তিত্ব ঠিক কাঠ-বালি-পাথরের মতো দেশ-স্থান-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

একটা ব্যাপার ল(্য করার মতো যে মন ছাড়া দেহ হতে পারে। যেমন জড়পিণ্ডবৎ মৃতদেহ বা কোমায় আচ্ছন্ন রোগীর দেহ। মনুষ্যেতর প্রাণীদের দেহ আছে কিন্তু মন নেই বলা হয়। মন ছাড়া দেহ হলেও দেহ ছাড়া কিন্তু মন হয় না। মন জড়দেহ আশ্রয় করেই একমাত্র তার অশরীরী অস্তিত্ব ঘোষণা করতে পারে। ভাবুক মন একান্তভাবে জড়দেহ নির্ভর কিন্তু জড়দেহ ততদূর মন-নির্ভর নয়।

ব্যক্তি(কেবল নিজে তার মনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারে। অন্যেরা তা সোজাসুজি জানতে পারে না। আমিই আমার মনকে জানার যোগ্যতম ব্যক্তি(। অবশ্য কথাটা সবটা ঠিক কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আমার আমাকে জানার বাস্তবিক কতটা স্বাধীনতা আছে, কতটা বাস্তব ও নিরপে(সম্ভাবনা আছে তা প্র(েময়। তাছাড়া ব্যক্তি(বাহ্যজগত এবং মনের ত্রি(য়াকলাপের পরিণতি জানতে পারে মাত্র। মনের আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ জানতে অপারগ।

কোন ব্যক্তি(র মনকে অন্যেরা জানে ঐ ব্যক্তি(র ভাষায় প্রকাশিত কথা থেকে এবং অঙ্গ -ভঙ্গী ও আচার-আচরণ থেকে। অর্থাৎ পরো(ভাবে। এখানেও সঠিক জানার সমস্যা

আছে। কেননা অর্থবোধ বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের উপর নির্ভর করছে। তবু মনের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম জানতে বুঝতে পরী া নিরী া করতে পরো পথটাই পথ।

শিল্প-কাব্য-সাহিত্য মন নিয়ে চর্চা করে। নানা অনুভূতি নিয়ে চর্চা করে। বিচিত্র জগতে ততোধিক বিচিত্র মানুষের মন। অবিরত মনের সঙ্গে মনের মিল এবং অমিল। সেই সব টানাপোড়েনের কথা বলতে চেষ্টা করে। এ হল একভাবে মন নিয়ে চর্চা।

আরেকভাবেও চর্চা হতে পারে। মনের গতি-প্রকৃতি বুঝতে, মনের রহস্য অনুধাবন করতে, দেহের সঙ্গে, বাহ্য প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মনের কতটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে তা জানতে অন্যভাবে সেই চর্চা করা হয়। সেসব বস্তুকেন্দ্রীক চর্চা। মনের রহস্যজাল উন্মোচনে সে পথও অন্যতম দিশারী।

।৩।

মন বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি? বুঝি চিন্তাভাবনা, স্মৃতি, অনুভুতি। বুঝি যুক্তি, ন্যায়-অন্যায় বোধ। মনের উপর দিয়ে বয়ে যায় আনন্দ-বেদনার জোয়ার-ভাঁটা। মনে জন্মে উৎসাহ উদ্দীপনা। মনের মধ্যে বাসা বাঁধে মন কেমন করা রোগ। মন উসখুস করে। কখনো কাঁদে।

মন কাজ করে চলে অবিরাম। এই কাজ করাটাই আসল কথা। মন যেন ক্রিয়ামূলক কিছু। তাই মন নয় মননই হল আসল কথা। মনন অনেকগুলো ক্রিয়ার সমষ্টি — চিন্তা করা, মনে রাখা, মনে করা ইত্যাদি। অন্যভাবে বাহ্য জগতের এবং নিজ দেহের তথ্য (সংবেদন) গ্রহণ করে আত্মস্থ করা, তথ্য জমিয়ে রাখা এবং প্রয়োজনমতো তা পুনরুদ্ধার করতে পারা, পুনর্বিন্যস্ত করা, এবং সেসব দ্বারা মগজ-নিয়ন্ত্রিত কর্মসকল চালানো। যেহেতু মন বলে কোন দেহাঙ্গ নেই, তাই মন আছে বলে মনন নয়, বরঞ্চ মনন আছে বলেই মনের থাকা। পরিপাক যন্ত্র বলে কোন দেহাঙ্গ নেই অথচ পরিপাক নামের জটিল ক্রিয়া আছে। একাধিক যন্ত্র মিলে যৌথ উদ্যোগে সেই কাজটা করে। সেই রকম মন নামে কোন দেহাঙ্গ নেই বটে কিন্তু মননের মতো জটিলতম কাজটা আছে। অনেক দেহাঙ্গ মিলে সেই কাজটা সম্পন্ন করে।

মূল প্রশ্ন তাই মন আছে কি নেই তা নয়। মূল প্রশ্ন মনন কী করে হয়? কোন কোন দেহাঙ্গ এর সঙ্গে জড়িত? কীভাবে দেহাঙ্গ কাজ করে? মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর মন হয় কিনা? দেহ যেমন বিবর্তনের ফসল, সরল থেকে জটিলরূপে, মনও কী তাই? এ সব জানা হলেই মন জানা হবে।

।৪।

আমরা আজকাল অনেক নিশ্চিত হয়েছি মননের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেহজ অঙ্গ। প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মগজ, ইন্দ্রিয়সকল এবং সংযুক্ত অনেক স্নায়ুকোষ। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অনেকটা দেহযন্ত্রের হেডকোয়ার্টার। সমস্ত কাজের পরিচালন ব্যবস্থা এখান থেকেই হয়। এর দুটি খণ্ড — সুষুম্নাকাণ্ড এবং মগজ। মগজের আবার তিনটি ভাগ — পশ্চাৎ-, মধ্য - এবং পুর-মস্তিষ্ক।

উন্নত জীবের ক্ষেত্রে পুরমস্তিষ্কের বিকাশ সর্বোচ্চ। এখানে রয়েছে গুরু(মস্তিষ্ক (সেরিব্রাম) যার বাইরের স্তরটিকে বলে সেরিব্রাল কর্টেক্স। ১০০০ কোটি স্নায়ুকোষ দিয়ে গড়া। নানা রকমের স্নায়ু কয়েকটি স্তরে অত্যন্ত জটিলভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। মগজের মধ্যে কর্টেক্স এমনভাবে ভাঁজ খাওয়া যেন তাকে ঠেসে ভরে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট খুলির মধ্যে। তার সামনের দিকের ভাঁজকে বলে ফ্রন্টাল লোব, পেছনের ভাঁজকে অক্সিপিটাল লোব, তার উপরের দিকে প্যারায়েটাল লোব আর দুপাশে টেম্পোরাল লোব। ফ্রন্টাল ও প্যারায়েটাল লোবের মধ্যে রয়েছে একটি খাঁজ — সেন্ট্রাল ফিশার। তার একপাশে মোটর এলাকা অন্যপাশে সংবেদন এলাকা (সেন্সেশন এরিয়া)।

মগজের বিভিন্ন এলাকায় আছে বিভিন্ন অনুভূতির অঞ্চল। অক্সিপিটাল এলাকায় দর্শনের জন্যে নির্দিষ্ট অঞ্চল, টেম্পোরাল এলাকায় শ্রবণ অঞ্চল, এক জায়গায় বাক-অঞ্চল (ব্রোকা এরিয়া), আরেক জায়গায় ঘ্রাণ অঞ্চল। বিজ্ঞানী ব্রডম্যান সেইমতো কর্টেক্সকে ৫২টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন।

গুরু(মস্তিষ্ক দুটি অর্ধগোলককে বিভক্ত। যুক্ত রয়েছে কর্পাস ক্যালোসাম দ্বারা। দেহের বাঁদিকের দেহাঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্যে ডানদিকের অর্ধগোলকটি এবং ডানদিকের জন্যে বাঁদিকের অর্ধগোলকটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এখানে রয়েছে কডেট নিউক্লিয়াস এবং পুটেনাম সহ কর্পাস স্ট্রিয়াটাম, প্যালিডাম, হাইপোক্যাম্পাস-ফর্নিক্স- অ্যামাগডালা নিয়ে লিম্বিক সিস্টেম। আরেক অংশে রয়েছে সেরিব্রাল পেডাঙ্কল, লাল নিউক্লিয়াস কেন্দ্র।

মধ্য মস্তিষ্কে রয়েছে থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, লঘুমস্তিষ্ক (সেরিবেলাম)। সেরিবেলামের বাইরের স্তরকে বলে সেরিবেলার কর্টেক্স। এর একাংশের নাম রাখা হয়েছে নিওসেরিবেলাম — মানুষ ও বনমানুষদের বেলায় যার বিকাশ সর্বাধিক। পশ্চাৎ মস্তিষ্কে রয়েছে সুষুম্নাশীর্ষক (মেডালা অবলঙ্গেটা), মস্তিষ্ক সেতু (পন্স), রেটিকুলার ফর্মেশন।

স্নায়ুকোষ সমগ্র দেহে সূতোর মতো স্নায়ুতন্তু দিয়ে অজস্র জাল বিস্তার করে আছে। মানুষে এবং অমানুষে। মগজে, সুষুম্নাকাণ্ডে, ইন্দ্রিয়কেন্দ্রে এবং পেশী-ত্বক-ভিতরের দেহাঙ্গ গুলোতে। অনেকটা রক্তবাহী শিরা-উপশিরার মতো। স্নায়ুতন্ত্রের কিছু কাজকর্ম হয় আপনা আপনি আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই। এরা স্বনিয়ন্ত্রিত (অটোনমিক) স্নায়ু।

যেমন হৃৎপিণ্ডের কাজে নিযুক্ত(স্নায়ু। খানিকটা কাজকর্ম আংশিক নিয়ন্ত্রিত বলা যায়। স্নায়ুতন্ত্রের আর কিছুটা কাজকর্ম সেভাবে নিয়ন্ত্রিত নয় আর. সেখানেই আমাদের মনের জোর খাটে বা ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রভাব খাটে।

জৈব উপাদানে গঠিত ইন্দ্রিয়সকল হল বাইরের জগতের খবর নেওয়ার জানালা। আলো-শব্দ-গন্ধ-স্বাদ-স্পর্শ ইত্যাদি মারফৎ খোঁজ নেওয়ার সংবেদনকেন্দ্র। তথ্য গ্রহণকেন্দ্রও বটে। আলোক শক্তি(, বায়ুকণায় ছড়ানো শব্দতরঙ্গ, গন্ধময় গ্যাসের কণা, স্পর্শজনিত চাপ ও তাপ যথানির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ে জৈব-রাসায়নিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কি করে এই প্রবাহ হয় তা আজ আমরা জেনেছি। কী করে প্রবাহ এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য স্নায়ুকোষে সাইনাপ্স হয়ে যায় সেসব জানাও সম্ভব হয়েছে।

প্রবাহিত উত্তেজনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছে একাধিক অঞ্চলে অভিঘাত সৃষ্টি করে। তবেই দর্শন হয়। চোখ থাকলেই দেখার কাজটা হবে এমন নয়। বস্তু থেকে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গ চোখের রেটিনাতে এসে পড়া চাই, রেটিনার সঙ্গে মগজের সঠিক স্নায়ু সংযোগ থাকা চাই, মগজের নির্দিষ্ট এলাকা উদ্দীপিত হওয়া চাই। তবে দর্শন হবে। কান থাকলেই শোনা যাবে এমন নয়। অনুভবের জন্যে যেমন সঠিক দেহযন্ত্র চাই তেমনি ভৌত শক্তি(বা বস্তুর সংঘাত চাই। না হলে ইন্দ্রিয় অচল, মগজ অচল।

সংবেদন কেন্দ্র থেকে অন্তর্মুখী (অ্যাফারেন্ট) স্নায়ুর মধ্য দিয়ে উত্তেজনা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যায়। সংবেদন মগজে গেলে তা থেকে বোধ (পার্সেপশন) জন্মে। তথ্য তখন র(ত হয় স্মৃতিতে। আর কর্মনির্দেশ আসে বহির্মুখী (এফারেন্ট) স্নায়ুর সাহায্যে। মগজ থেকে কর্মনির্দেশ যায় পেশীতে দেহাঙ্গে। কর্ম থেকে উৎপন্ন ফলাফল আবার সংবেদন-বোধ হয়ে মগজের স্মৃতিতে পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে (ফিডব্যাক মেকানিজম)।

তথ্য মগজে সংর(ত হতে পারে দুভাবে — মুখ্য স্মৃতি বা (ণকালীন স্মৃতি হিসেবে আর গৌণ স্মৃতি বা দীর্ঘকালীন স্মৃতি হিসেবে। মুখ্য স্মৃতিই মানসিক বর্তমান অবস্থা - চেতনার সঙ্গে তারই নিবিড় সম্বন্ধ। গৌণ স্মৃতি মানসিক অতীত। স্মৃতিভাণ্ডার থেকে তথ্য উদ্ধার করে তার বি(-ষণ-সং(-ষণ-পুনর্বিন্যাস করা হয়। সেটাই ভাবনা চিন্তা। তার দ্বারা তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত বা সংশোধিত হয়। এবং নতুনভাবে সংর(ত হয়।

আমাদের বোধ হয় এক মনোযোগ কেন্দ্র আছে। সেখানে কোন উত্তেজনা প্রবেশ করতে পারলে ধরে নিতে হবে যে সেই উত্তেজনা অন্যান্য উত্তেজনা থেকে প্রতিযোগীতায় এগিয়ে। সফল উত্তেজনা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যমান অর্জন করে পারিপার্শ্বিক পরিপ্রে(তে। ককটেল পার্টিতে নানা কোলাহলের মধ্যেও একজনের কথা নির্বাচিত হয়ে মগজে প্রবেশ করতে পারে। আবার আরেকদিক থেকে চেনা নাম কানে গেলেও সেদিকে মনোযোগ ধেয়ে যেতে পারে। সঠিক অর্থবোধের জন্যেও মনোযোগ প্রয়োজন।

নানা পথ ধরে উত্তেজনা মগজে যায়। দেখা গিয়েছে যেসব উত্তেজনার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়নি তারা মনোযোগ আকর্ষণকারী উত্তেজনাকে প্রভাবিত করতে পারছে। এটা থেকেই আমাদের সমান্তরাল উত্তেজনা-প্রবাহের ধারণা হয়।

মানুষের মস্তিষ্কে সারা(ণ পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎবিভব বর্তমান। কারণ মস্তিষ্ক কমবেশী সর্বদা সক্রি(য়। ১৯২৪ সালে হান্স বার্জার প্রথম মানুষের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎবিভব মাপেন। এখন তো হামেশাই মাপা হচ্ছে যাকে আমরা ই-ই-জি (ইলেকট্রো-এন্সেফালোগ্রাম) বলি তাতে। এ থেকে অনুমাণ হয় - মননের সঙ্গে জৈব বিদ্যুতের যোগ আছে। তার সঙ্গে জৈব-রসায়নের।

মননের কাজটা অত্যন্ত জটিল। যে কোন জটিল কাজের সমস্যাটির সমাধান করতে সরলীকৃত মীমাংসা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। মগজে ঠিক কীভাবে তথ্য প্রক্রি(য়াকরণ হচ্ছে তা নিয়ে নানা খোঁজখবর চলছে। মনে হচ্ছে তথ্য প্রক্রি(য়াকরণের ফলাফলই চেতনা বা মন। প্র(হল — মগজে তথ্য ঠিক কি ভৌত প্রক্রি(য়ার মাধ্যমে স্মৃতি হয়ে ওঠে? সংবেদন-স্মৃতি থেকে মোটর অঞ্চলে নির্দেশ আসার মধ্যে কি অতিসক্রি(য় কোন অঞ্চল আছে? সেটা কি মনোযোগ কেন্দ্র? কিংবা মন বা চেতনা? পটেন্সিয়ালের জন্য তথ্য কি আপনা আপনি মনোযোগ কেন্দ্রে চলে যেতে পারে? মগজে নানা তথ্যের সং(-ষণ-বি(-ষণ হয় বটে কিন্তু সবার উপরে এমন ধারণা আমাদের কি করে হয় যে সবটাই একমুখী স্রোতের মতো পরস্পর সংযুক্ত((বাইন্ডিং প্রব্লেম)?

অনেক রকমের স্নায়ুকোষ আছে। তাদের আকার-গঠন সংবাদ-পাঠানোর গতি বিভিন্ন। সাধারণভাবে স্নায়ুকোষ (নিউরন) তিনটি অংশে বিভক্ত(— মূলদেহ অ্যাক্সোপ্লাজম, সূতোর মতো দীর্ঘ অ্যাক্সন, ডালপালার মতো ছড়ানো ডেনড্রাইট। এক স্নায়ু অন্য কোষে অ্যাক্সন মারফৎ সংবাদ পাঠায় এবং অন্য কোষ তার ডেনড্রাইট দিয়ে সংগ্রহ করে। অ্যাক্সন-ডেনড্রাইটের সংযোগস্থলকে বলে সাইন্যাপ্স। ১৯২১ সালে বিজ্ঞানী অটো লোভি আবিষ্কার করেছেন যে স্নায়ুকোষের উদ্দীপনায় এক রাসায়নিক পদার্থ (নিউরো-ট্রান্সমিটার) নির্গত হয়। সাইন্যাপ্সের মধ্য দিয়ে সংবাদ আদানপ্রদানে এই নিউরোট্রান্সমিটারের ভূমিকা বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ।

শুধু তাই নয়। এই জৈব রাসায়নিক পদার্থ অস্বাভাবিক আচরণ করলেই ব্যক্তি(র মানসিক অবস্থা ব্যাহত হয়। যেমন মস্তিষ্কের গাবা নিউরোট্রান্সমিটারের কাজকর্ম দুর্বল হলেই মানসিক উদ্বেগ বেড়ে যায়। আবার ওষুধ দিয়ে সেই নিউরো-ট্রান্সমিটারকে চাঙা করতে পারলে উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। এ সব থেকে বোঝা যায় মননক্রি(য়া কতটা রসায়ন-নির্ভর।

।৫।

মানসিক রোগের (ে ত্রে মগজের বিশেষ বিশেষ এলাকার সীমাবদ্ধতা আছে। স্কিজোফ্রেনিয়া, অবসাদ (ডিপ্রেশন), ম্যানিক ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি নিউরোসিস এ সবের কারণ নিউরোট্রান্সমিটারের ত্রুটিপূর্ণ কাজ।

মৃগী রোগে মস্তিষ্ক যখন তখন উদ্দীপ্ত হয়। জন্মের সময় মগজের কোন অঙ্গহানির জন্যে এমনটা হতে পারে। এল-এস-ডি নামক রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবে হ্যালুসিনেশন হয়। অর্থাৎ অলীক চিন্তা বা দর্শন করে। স্কিজোফ্রেনিয়া মানসিক রোগেও রোগী বাস্তবজগত থেকে আলাদা হয়ে অলীক স্বপ্নের জগতে বাস করে। তাহলে এল-এস-ডি যেভাবে মস্তিষ্কে প্রতিত্রি(য়া সৃষ্টি করে, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর বেলায় জন্মগত কারণে অথবা অন্যভাবে কি অনুরূপ প্রতিত্রি(য়া হয় ভাবা যায়?

অনিয়ন্ত্রিত কম্পন হয় পার্কিনসন রোগে। তার কারণ মগজের এক্সট্রা-পিরামিডাল অঞ্চলে ডোপামিন নামক নিউরোট্রান্সমিটারের কাজে গণ্ডগোল। বৃদ্ধ বয়সের স্মৃতি ভ্রংশ রোগ হল অ্যালজাইমার্স রোগ। তার কারণ হিসেবে বলা হয় অ্যাসেইটাইল কোলিন নামক এনজাইমের ঘাটতি এবং কিছু (তিকর প্রোটিন তৈরী হওয়া।

মাথায় চোট আঘাত লাগলে বা অন্যভাবে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোন অঙ্গের হানি হলে মননত্রি(য়া ব্যাহত হয়। অর্থাৎ মনন স্বাভাবিক ও সাবলীল থাকতে পারে না। মস্তিষ্কের এক একটি অঞ্চলের হানিতে এক এক জাতীয় মানসিক ত্রি(য়া ব্যাহত হতে দেখা গিয়েছে। এই সব বিপর্যয় থেকে বোঝা যাচ্ছে মননত্রি(য়ার সঙ্গে মগজের যন্ত্রপাতির কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

অ্যামনেসিয়া রোগীর ভয়ানক স্মৃতি বিপর্যয় হয়। এক মিনিট আগে জানা অভিজ্ঞতাও সে নাকি মনে করতে পারে না। একটু আগে যার সঙ্গে বসে কথা হয়েছে তাকে পর্যন্ত চিনতে পারে না। মিডিয়াল টেম্পোরাল লোব অথবা মিডিয়াল থ্যালামাসে (তির দ(ন এমন হতে পারে।

রেট্রোগেড অ্যামনেসিয়া রোগীদের দেখা যায় যে তারা দুর্ঘটনার আগেকার সমস্ত অতীত ভুলে গিয়েছে, বিশেষ করে কয়েক বছর আগেকার ঘটনা। আবার উল্টো ব্যাপারও হয়। শের আফগান নাটকের নায়কের মতো স্রেফ অতীতের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

ব্লাইন্ডস্পট রোগীদের ভিসুয়াল কর্টেক্স (তিগ্রস্থ হওয়ার জন্যে তারা দর্শন(মতা হারায়। তা সত্ত্বেও তারা পরী(াগারে এমন কিছু করতে পারে যা থেকে মনে হয় তারা চোখে দেখতে না পেয়েও যেন দেখতে পাচ্ছে। অর্থাৎ চেতনাহীন অবস্থাতেও কাজ করতে পারছে। ভিসুয়াল কর্টেক্স ছাড়া অন্য স্নায়ু- সংযোগ কাজে লাগিয়ে। তা থেকে মনে হচ্ছে এক একটা কাজের জন্যে মগজের একাধিক অঞ্চল নিযুক্ত(।

এ সব থেকে বোঝা যায় যে মানসিক প্রত্রি(য়ায় জৈব দেহাঙ্গের ভূমিকা কত গু(ত্বপূর্ণ। মননে অবস্তুর প্রয়োজন নিয়ে তখন সন্দেহ দেখা দেয়।

।৬।

মননত্রি(য়ার সময়ে মগজের ভিতরে কোন কোন বিশেষ অঞ্চল কোন কোন নির্দিষ্ট উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয় তা আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে ল(্য করা যাচ্ছে। ই-ই-জি, ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং, পেট (পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি), সি-টি স্ক্যান ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে মগজের ভিতরের ছবি পাওয়া যাচ্ছে। চোখে দেখার সময়ে মগজের কোন কোন এলাকা জড়িত (যেমন ভি-১ এলাকা), কথা বলার সময়ে কোন কোন এলাকা সাড়া দেয় (যেমন ব্রোকা এবং ওয়ার্নিক এলাকা), ভাবনার সময়ে কোন কোন অঞ্চল ভাবিত হয়, অঙ্ক কষার সময়ে আবার কোন কোন অঞ্চল তার খানিকটা হিসেব পাওয়া যায় এই সব ছবি থেকে । কর্টেক্স ছাড়া আর কোন কোন এলাকা সত্রি(য় হয় তাও জানা সম্ভব হচ্ছে। তা থেকে আমাদের ধারণা দৃঢ় হওয়ার অবকাশ পায় যে এক এক ধরণের মননের সঙ্গে মস্তিষ্কের কিছু কিছু অঞ্চলের বিশেষ ভূমিকা আছে।

।৭।

অল্প কিছুদিনের গবেষণার ফলে মস্তিষ্ক নিয়ে আমাদের যতটুকু চেনাজানা। মোটেই বিশদভাবে তা জানা সম্ভব হয় নি। মগজের ভিতরের নানা স্নায়ু, স্নায়ুজট, স্নায়ু-স্তর ঠিক কিভাবে সংযুক্ত(আমরা এখনো তেমন ভালো করে জানি না। তবু সম্ভাবনাময় একাধিক মডেল নিয়ে মননত্রি(য়ার কার্যধারা কেমন করে ঘটতে পারে তা বুঝতে চেষ্টা করছি।

যদি ধরে নিই মন বলে কিছু আছে, তবে সেই মনটা কিন্তু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় না। জন্মের সময় কোন মনন থাকে না। তখন শিশুর মগজ থাকে অপরিণত। স্নায়ুতন্ত্র অপরিণত। তারপর মগজ পরিণত হতে থাকে। সেই সঙ্গে মনন ত্র(মশঃ বিকশিত হতে থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগত থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে, বাবা-মা-আত্মীয়-পরিজন-প্রতিবেশী-বন্ধুবান্ধব থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে। শিশুও চোখ-কান-মুখ দিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে পেশী সঞ্চালন করে বাহ্য জগতের সঙ্গে বাস্তব ত্রি(য়া করতে থাকে, পরিচিত হতে থাকে, নিজেকে দুনিয়ার উপযুক্ত(করে তুলতে থাকে অপটু প্রয়োগের চেষ্টা করে করে। একটা মাত্রা পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ হলে তবেই সে নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য নিজেই সরবরাহ করতে পারে। কম্পুটারে যেমন সফটওয়ার না ভরলে হার্ডওয়ার কাজ করে না অনেকটা তেমনি।

একটা পর্যায় পরে সে নিজের মনের অস্তিত্ব টের পায়। আমিত্ব গড়ে ওঠে। আত্মসচেতন হয়ে ওঠে।

তথ্যসংগ্রহের কাজে ভাষা এক অপরিহার্য মাধ্যম। ভাষা ছাড়া মানুষের মগজের কার্যকরী বিকাশ অসম্ভব। ভাষা দিয়ে বস্তুর এবং ত্রি(য়াকর্মের নামকরণ হয়। সবকিছুই তো নাম দিয়ে যায় চেনা। এই লেবেলিং না করা হলে মগজের স্মৃতিপ্রকোষ্ঠে তথ্য ঠিকমতো রাখা যাবে না যাতে প্রয়োজনের সময়ে সহজে নির্দিষ্ট তথ্যটি উদ্ধার করা যায়। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে ভাষার যুগান্তকারী ভূমিকা আছে। মননের মডেল খানিকটা হয়তো এমনই।

।৮।

বিবর্তনের ফলেই সরল জীবদেহ ত্র(মশঃ জটিল হয়েছে। অমে(দণ্ডী প্রাণী থেকে মে(দণ্ডী প্রাণী হয়েছে। মে(দণ্ডী প্রাণীদের দীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় এসেছে স্তন্যপায়ী প্রাণীকুল। এদের মধ্যে একদল প্রাইমেট। এই দলে পড়ে বানর, বন-মানুষের দল (শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাংওটাং), বনমানুষ-মানুষ হিসেবে অধুনালুপ্ত অস্ট্রালোপিথেকাস দলভুক্ত(রা, আর সেই সঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টায় পা বাড়ানো হোমো দলের প্রজাতিকুল।

মানুষের যদি মন থাকে তবে তার নিকটতম প্রজাতির মধ্যে কি মনের কোন আদিম রূপ ল(্য করা যাবে? এই ভাবনা দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে মনের খোঁজ করতে বসেছে।

তিন রকমের বনমানুষদের মধ্যে শিম্পাঞ্জীদের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী। অনেক বিজ্ঞানী তাদের মুখে কথা ফোটাতে চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ এ-এস-এল (আমেরিকান সাইন ল্যাংগুয়েজ) শেখাতে চেষ্টা করেছেন। কেউ তাদের বোধশক্তি(আছে কিনা তা পরী(া করছেন। অথবা যন্ত্র ব্যবহার করার মতো উদ্ভাবনী শক্তি(আছে কিনা তা জানতে চেষ্টা করছেন।

বিজ্ঞানী গার্ডনার শিম্পাঞ্জী ওয়াশো-কে এ-এস-এল শিখিয়েছেন। ডেভিড প্রেমাক সারা-কে প-াস্টিক সিম্বল দিয়ে কথা বলতে শিখিয়েছেন। দুয়েন রামবওগ লানা-কে কম্পুটার কিবোর্ডে কথা বলাতে চেষ্টা করেছেন। সু-স্যাভেজ রামবওগ অস্টিন এবং সারাকে আবার লেক্সিগ্রামে ভাষা রপ্ত করিয়েছেন। জাইরে থেকে আনা বোনোবো শিম্পাঞ্জী কাঞ্জী-কে ট্রেনিং দিয়েছেন। তাঁর অভিমত — বনমানুষ আড়াই বছরের মানবশিশুর মতো বুদ্ধিসম্পন্ন(ভাবনা-ইচ্ছা-বাসনা প্রকাশে স(ম।

উলফগ্যাং কোহলার আবারপরী(া করে দেখেছেন যে যন্ত্র ব্যবহার করার মতো খানিকটা বুদ্ধি শিম্পাঞ্জীদের আছে। জেন গুডাল নাকি তাঞ্জানিয়ার গোম্বে রিসার্চ সেন্টারে বন্য শিম্পাঞ্জীদের গাছের ডালকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে গর্ত থেকে উইপোকা তুলে খেতে দেখেছেন। এমিল এঞ্জেল এক শিম্পাঞ্জীকে পরী(া করে দেখেন যে সে লুকোনো খাবারের জায়গা মনে করে করে ঠিক খুঁজে বার করতে পেরেছিল।

গরিলাদের নিয়েও এই রকমের পরী(া করা হয়েছে। পেনি প্যাটার্সন কোকো গরিলাটিকে নাকি ৫০০ টি এ-এস-এল শেখাতে সফল হয়েছেন।

আর অনেক মানুষই তো দাবী করেন যে তারা গৃহপালিত পশুদের মধ্যে কিছুটা বোধবুদ্ধি ল(্য করেছেন। তাদের ধারণা এই অবোধ প্রাণীদের একটা প্রাণীসুলভ মন আছে, অনুভূতি আছে এবং স্মৃতিশক্তি(আছে।

এই সকল প্রাণীদের এবং মানুষের নিকটতম প্রজাতির উপর পরী(া নিরী(া চালিয়ে আমাদের ত্র(মশঃ ধারণা হচ্ছে প্রাণীদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের মননের আবির্ভাব সম্ভব এবং তা মগজেরই কারসাজিতে। মন জাতীয় কোন ভাবের নয়।

।৯।

জৈব বিবর্তনের প্রথম ধাপে যে সরল এককোষী জীব আবির্ভূত হয়েছিল তাদের স্নায়ুতন্ত্র ছিল না। ইন্দ্রিয় ছিল না। পরে বহুকোষী জীবে তা আবির্ভূত হয়। কোটি কোটি বছর আগে কোয়েলান্টারাটা জাতীয় জীবে প্রথম দেখা যায় দেহ জুড়ে ছড়ানো স্নায়ুজালিকা। তারপর স্নায়ুজালিকার উন্নতরূপ স্নায়ুজট দিয়ে গঠিত গ্যাংলিয়া সমৃদ্ধ স্নায়ুজালিকা। স্নায়ুজট বিবর্তিত হয় সংবেদন কেন্দ্রে। জেলিফিসে বোধ হয় প্রথম দেখা যায় গ্যাংলিয়া এবং ইন্দ্রিয় তথা সংবেদন কেন্দ্র।

ওয়ার্ম শ্রেণীর প্রাণীদের সংবেদন কেন্দ্র মাথায় জড়ো হয়েছে। সেখান থেকে দুটি নার্ভকর্ড লেজ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই ওয়ার্মের মধ্যে আদিম ইন্দ্রিয়ের চিহ্(ল(্য করা যায়। আরো জটিলতা এসেছে গ্যাংলিয়া জুড়ে তৈরী হওয়া নার্ভসেন্টার তথা স্নায়ুকেন্দ্রে। মগজের উৎপত্তি সেখান থেকে।

জীবদেহে এক সময় দেখা গেল টিউবের মতো স্নায়ুতন্ত্র। এর এক দিকটা হয়ে উঠল মগজ অন্যদিকটা স্নায়ুকাণ্ড। মে(দণ্ডী প্রাণীদের মগজ আশ্রয় পেল করোটির মধ্যে আর স্নায়ুকাণ্ড মে(দণ্ডের মধ্যে।

জৈব বিবর্তনের ফলে জীবদেহ যত জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে ততই তার উন্নততর এবং জটিলতর স্নায়ুতন্ত্র-ইন্দ্রিয়াদি-মগজের প্রয়োজন হয়েছে এবং তা আবির্ভূত হয়েছে। স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাস থেকে তার সমর্থন মেলে। আর স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থেকে কি মনে হতে পারে না যে মননের আবির্ভাবের জন্যেও বিবর্তনের এক ইতিহাস থাকা সম্ভব?

।১০।

আধামানুষদের যতটা খবরাখবর পাওয়া গিয়েছে তা থেকে জানা যাচ্ছে যে মানুষ যতই ত্র(মশঃ মানুষ হয়ে উঠছিল ততই তাদের মস্তিষ্কের আয়তন-ওজন বাড়ছিল। নিকটতম এপ-প্রজাতির মস্তিষ্কের গড় ওজন — ওরাংওটাং ৩৪০ গ্রাম, শিম্পাঞ্জী ৩৮০ গ্রাম আর গরিলার ৫৪০ গ্রাম। গড় আয়তনের হিসেবে ধরা যেতে পারে যথাত্র(মে ৩৩৮-৪১৬ সিসি (ঘন সেন্টিমিটার), ৩৫০-৩৮১ সিসি এবং ৪৪৩-৫৩৫ সিসি।

আধামানুষদের মধ্যে নানা মাপের মস্তিষ্ক দেখা গিয়েছে। ২৫ ল(বছর আগেকার দ(িণ আফ্রিকা থেকে পাওয়া অস্ট্রালোপিথেকাস দলের এক প্রজাতির মস্তিষ্ক-মাপ হয়েছিল ৪৮৫ সিসি।

হোমো গণের মানুষ-প্রজাতি হোমো হ্যাবিলিস থেকে হোমো ইরেক্টাস হয়ে হোমো স্যাপিয়েন্স বিবর্তিত হয়েছে। তাঞ্জানিয়ার ওল্ডুভাই থেকে পাওয়া ১৭.৫ ল(বছর আগেকার এক হোমো হ্যাবিলিসের মস্তিষ্ক-মাপ পাওয়া গিয়েছে ৬৮০ সিসি। কেনিয়ার পূর্ব তুর্কানা হ্রদ এলাকা থেকে ঐ দলের ১৪৭০-মানব নামে পরিচিত জীবাশ্মের মগজের মাপ দাঁড়িয়েছিল ৮০০ সিসি।

হোমো ইরেক্টাস দলভুক্ত(জাভা মানবের মগজ ছিল ৭৭৫-৯৪০ সিসি আর পিকিং মানবের ৮৫০-১৩০০ সিসি মাপের। হোমো দলের নিয়ানদার্থলরা মানুষ হয়ে উঠতে উঠতেও হতে পারে নি। ১ ল(থেকে ৩৫ হাজার বছর আগে তারা ছিল এই ধরাতলে।

মাত্র ৩৫ হাজার বছর আগে ফ্রান্সের ত্রে(ম্যাগনন মানুষের ে(ত্রে সেই মাপ এসে দাঁড়াল ১৫৯০-১৭৫০ সিসি। এরাই যথার্থ মানুষ পদবাচ্য। এবার মিলিয়ে দেখুন বর্তমানের মানুষের মস্তিষ্কের ওজনের সঙ্গে গড়ে যা ১৪৫০ গ্রাম আর আয়তনের সঙ্গে যা ১২০০ থেকে ২০০০ সিসির মধ্যে থাকে। এভাবে মস্তিষ্কের গু(ত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছিল উন্নততর প্রজাতির মধ্যে। মনের বিকাশ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগোচ্ছিল।

।১১।

এই সব তথ্যভাণ্ডার ঘেঁটে এবং যুক্তি(তর্কের অলিগলি ঘুরে সবশেষে কি তাহলে বলা যাচ্ছে যে মন বলে আলাদা কোন অশরীরী সত্তা নেই? মনকে তাহলে কি মননের নামান্তর ভাবাই সুবিধেজনক নয়? সেই মননত্রি(য়া যেন চলছে মগজ-ইন্দ্রিয়-স্নায়ুতন্ত্রের বিবিধ ত্রি(য়া-প্রতিত্রি(য়া হিসেবে। জৈব রাসায়নিক-বৈদ্যুতিক প্রত্রি(য়ার মধ্য দিয়ে। জড়বস্তুর গুণপনা হিসেবে।

অবশ্য এখনো আমরা অনেক গু(ত্বপূর্ণ প্র(নেরই উত্তর জানি না। জানি না কীভাবে তথ্য স্মৃতি হিসাবে মগজে সংর(িত হয়। জানি না কীভাবে সচেতন ভাবনা কিংবা ইচ্ছে করা সম্ভব হয়। ভালোলাগা বা মন্দলাগা বস্তুগতভাবে ঠিক কী? অনুভুতি কী করে হয়? এমনি অনেক অনেক প্র(ন।

বিজ্ঞানীরা এই মন তথা মননের হদিশ পেতে চেষ্টা করছেন বিশদভাবে। নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সেজন্যে গবেষণা হচ্ছে। আশা করি তাদের কর্মযজ্ঞ একদিন সফল হবে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে মনন জড় বস্তুর গুণ হিসেবে বিরাজ করছে।

তবু। তবু প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে কি একটা অস্পষ্ট হলেও ধারণা হচ্ছে না যে মনন যেন সবটাই মগজের কারসাজি?

অনেকে ভাবেন এসব বস্তুবাদী জ্ঞানগম্যি ভাব-জগতের ে(ত্রে প্রবল অন্তরায়। বোধ হয় তা ঠিক নয়। চাঁদের মাটি-পাথরের কথা জেনে কই জ্যোৎস্নায় রূপমুগ্ধ হওয়া তো মাটি হয়নি। আসলে যা হবে তা সত্যদর্শন মাত্র এবং সত্যই সুন্দরতম।

(শিল্পলিপি, শারদ ১৪০৮/২০০১)